রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) ছিলেন একজন অগ্রণী বাঙালি বহুবিদ্যাবিদের একজন বিজ্ঞানী, প্রাবন্ধিক এবং লেখক যিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যিক সৌন্দর্যের সাথে মিশ্রিত করে নান্দনিক দর্শনে (সৌন্দর্য তত্ত্ব) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। নন্দনতত্ত্বের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা সাহিত্যে অনন্য ছিল, প্রায়শই তাকে "বিজ্ঞানের আনন্দ এবং পরমানন্দ" হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

সৌন্দর্য্য তত্ত্ব *(নন্দনতত্ত্ব)*সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ এখানে দেওয়া হল :

- **বিজ্ঞান এবং নান্দনিকতার মিথস্ক্রিয়া:** পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নের একজন পণ্ডিত ত্রিবেদি বিজ্ঞান এবং সৌন্দর্যকে পারস্পরিকভাবে পৃথক হিসেবে দেখতেন না। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বিস্ময় এবং নান্দনিক আনন্দের উৎস হতে পারে, যা দর্শনকে দৈনন্দিন আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করে।

- **সহজলভ্য দার্শনিক গদ্য:** জটিল বিষয়গুলিকে সহজলভ্য করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। *সাহিত্যের*মতো জার্নালে প্রায়শই প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলি জটিল বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং অধিবিদ্যাগত ধারণাগুলিকে জনপ্রিয়, আকর্ষণীয় বাংলা গদ্যে রূপান্তরিত করেছিল।

- **ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা:**সৌন্দর্য্য *(সৌন্দর্য্য) সম্পর্কে তাঁর ধারণা* প্রায়শই প্রাকৃতিক জগৎ এবং মানব অস্তিত্ব বোঝার ফলে উদ্ভূত আনন্দ, বিস্ময় এবং বৌদ্ধিক তৃপ্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

- **সাহিত্যিক বুদ্ধি:**বিচিত্রা প্রসঙ্গের *মতো তাঁর প্রবন্ধগুলিতে*, তিনি গুরুতর দার্শনিক অনুসন্ধানকে হাস্যরস, বিদ্রূপ এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে একত্রিত করেছেন, যা প্রমাণ করেছে যে জ্ঞান অর্জন নিজেই একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা।

- **সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট:**তাঁর রচনায় ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান (যেমন *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সম্পর্কে তাঁর রচনা) এবং আধুনিক, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার* মিশ্রণ প্রতিফলিত হয়েছে ।

সংক্ষেপে, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদি'র *সৌন্দর্য্যতত্ত্ব* সত্যের সৌন্দর্য আবিষ্কার, প্রকৃতিকে বোঝার বৌদ্ধিক আনন্দ এবং সাহিত্যিক, সহজলভ্য ভাষার সাথে বৈজ্ঞানিক যুক্তির মিশ্রণ দ্বারা চিহ্নিত।

'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের' শুরুতেই রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের মতো যুগধর্মের ব্যাখ্যায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সন্ধানে, সমকালীন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে শিক্ষাসংস্কৃতির ও রীতিনীতির আলোচনায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শগত পার্থক্য ও জাতীয়তাবোধের স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতির আলোচনায় তিনি ইওরোপ ও ভারতের মূল প্রবণতার দিকটি উপস্থাপিত করেছেন।

জন্ম-:
মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুরের কাছে টেয়া-বৈদ্যপুরগ্রামে রামেন্দ্রসুন্দর জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে। শৈশবকাল থেকেই রামেন্দ্রসুন্দর লেখাপড়ায় কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছিলেন। কোন পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নি, সর্বত্রই তিনি প্রথম স্থান পেয়েছেন। কর্মজীবনে তিনি রিপন কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হিসেবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিজ্ঞানের যুক্তিবোধ, দর্শনের সত্যনিষ্ঠা এবং আবেগহীন জাতীয়তাবোধ এই তিনের সমন্বয়ে গঠিত ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) সেই পর্বের বাঙালি, যখন এই উপনিবেশে আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানচর্চা সবে খানিকটা অবয়ব ধারণ করছে। প্রমথনাথ বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রজন্মের মানুষ তিনি। সাহিত্য ও ইতিহাসের এই ডাকসাইটে ছাত্রটি ১৮৮৬ সালে বি এ-তে বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। সেকালের প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত রসায়নশিক্ষক আলেকজ়ান্ডার পেডলার-এর মতে, এরকম তীক্ষ্ণধী ছাত্র তিনি এদেশে আর পাননি। ১৮৮৭-তে এম এ, ১৮৮৮-তে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ। যথারীতি গুরুজনদের ইচ্ছা ছিল তিনি আইন পড়ে মস্ত উকিল হন- বাঙালিদের সৌভাগ্য, তিনি তা হননি। ১৮৮৮ সালে তিনি জীববিজ্ঞান নিয়ে কিছু চর্চা করেন। তবে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে হাতেকলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর বিশেষ ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর ঝোঁক ছিল দার্শনিক সূক্ষ্মবিচারের দিকে। কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাওয়ার প্রবল অনীহা থাকায়, অনেক ভাল ভাল পদের আহ্বান উপেক্ষা করে ১৮৯২ সালে তিনি রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়ে যোগ দেন। সেখানে বিনা ল্যাবরেটরিতেই চলত বিজ্ঞানের পাঠদান। ১৯০৭ সালে সেখানে তৈরি হল ল্যাবরেটরি, ১৯১৫ সালে চালু হল বি এসসি কোর্স। রামেন্দ্রসুন্দর এতদিন পড়াতেন রসায়ন, এবার পদার্থবিজ্ঞান পড়ানোরও ভার নিলেন। ১৯১৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন

রামেন্দ্রসুন্দর ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার জেমো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম গোবিন্দসুন্দর এবং মা চন্দ্রকামিনী। বাংলা ভাষার চর্চার জন্য বিখ্যাত হয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর, কিন্তু জন্মসূত্রে তিনি বাঙালি ছিলেন না। তার পূর্বপুরুষরা বন্ধুগল গোত্রের জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মের দু'শ বছর আগে থেকেই মুর্শিদাবাদে বসবাস করতো। এর ফলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে তাদের সকলের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং এক অর্থে তারা বাঙালিদের মতই বাংলার চর্চা করতে শিখেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সূচনার আগেই ১৮৭৮ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে জেমো রাজপরিবারের নরেন্দ্র নারায়ণের কনিষ্ঠ কন্যা ইন্দুপ্রভা দেবীর সাথে তার বিয়ে হয়।
শৈশবকাল থেকেই রামেন্দ্রসুন্দর মেধাবী ছিলেন। তিনি ১৮৮১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং এর ফলে ২৫ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফএ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং একটি স্বর্ণপদক ও বৃত্তি পান। একই কলেজ থেকে ১৮৮৬ সালে বিজ্ঞানে অনার্সসহ বিএ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র এফএ পরীক্ষা ছাড়া জীবনের অন্য সকল পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

কর্ম জীবন

যে সময় বিজ্ঞানশাস্ত্র ইংরেজি ভাষার বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল, দুর্বোধ্য বিদেশি ভাষা আয়ত্ত করে বিজ্ঞান শিক্ষা দুরূহ ছিল, তখন এই বাঙালি বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের জটিল তথ্যগুলো সহজতর করার জন্য বাংলায় বক্তৃতা দিতেন। বিজ্ঞান বিষয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মাতৃভাষাতেই ব্যাখ্যা করতেন। সেসব বক্তৃতা শোনার জন্য বিভিন্ন কলেজের ছাত্র এসে ভিড় করত তার কাছে। ১৮৯২ সালে রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্র কলেজ) অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। ১৯০৩ সালে সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

অবসর নেয়ায় রামেন্দ্রসুন্দর ওই কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। আমৃত্যু তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের সময় সমাজজীবনে জাতিভেদ প্রথা কঠোরভাবে পালিত হতো। উঁচু-নিচু ভেদাভেদ ছিল প্রখর। সামাজিক কুপ্রথা, জাতিগত বৈষম্য সমাজের দেহ-মনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। মানবধর্মই ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সহজ বুদ্ধি ও নিজস্ব যুক্তির দ্বারা তিনি সব রকম অমানবিক প্রথার বিরোধিতা করতেন। বিজ্ঞানে কোনো মৌলিক গবেষণা করে রামেন্দ্রসুন্দর খ্যাতি লাভ করেননি ঠিকই, তবু দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি, বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের জন্য তার অবদান অবিস্মরণীয়। বিজ্ঞানবিষয়ক বহু বই রচনা করে সাধারণের কাছে তিনি বিজ্ঞানকে সহজলভ্য করে তোলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যজীবনের শুরু সেই পাঠদ্দশায়। ২১ বছর বয়সেই নবজীবন পত্রিকায় তার প্রথম প্রবন্ধ 'মহাশক্তি' প্রকাশিত হয়। ক্রমে সাধনা, ভারতী, সাহিত্য, প্রদীপ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকায় এর উন্নতির জন্য আজীবন কঠোর পরিশ্রম করেন। ১৯১৪ সালে কলকাতা টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেশকরূপে বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ করতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি দিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। তিনি এর প্রতিবাদস্বরূপ প্রবন্ধ পাঠ প্রত্যাখ্যান করেন। শেষে উপাচার্য স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী বাংলাতেই তাকে প্রবন্ধ পাঠের অনুমতি দেন। বাংলা ভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধের এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাংলা ভাষায় সাধারণ পাঠকের কাছে বিজ্ঞান প্রচার তার একটি অসাধ্য সাধন কাজ। বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের মেলবন্ধন উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি বিজ্ঞানী হয়েও সার্থক সাহিত্যিক।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় সে বছর তাঁর আহবানে একদিন সমগ্র বাংলাদেশে অরন্ধন দিবস পালিত হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরোধী প্রতিক্রিয়ায় এ সময় তিনি রচনা করেন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা (১৯০৬) গ্রন্থখানি। তাঁর রচনা মুক্তচিন্তার আলোকে দীপ্ত ও সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে: প্রকৃতি (১৮৯৬), জিজ্ঞাসা (১৯০৩), কর্মকথা (১৯১৩), চরিতকথা (১৯১৩), শব্দকথা (১৯১৭), বিচিত্র জগৎ (১৯২০), নানাকথা (১৯২৪) প্রভৃতি। প্রথমটি বিজ্ঞান বিষয়ক এবং দ্বিতীয়টি দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। শব্দকথায় বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও পরিভাষা সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। আর নানাকথায় স্থান পেয়েছে যুগ ও জীবন, ব্যক্তি ও সমাজ, শিক্ষানীতি ও সমাজধর্মের কতিপয় প্রচলিত সমস্যা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত।
বাঙালিদের মধ্যে বেদচর্চার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন, যার প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকৃত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদ (১৯১১) ও যজ্ঞকথা (১৯২০) গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে। এ ছাড়া তিনি কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে *Aids to Natural Philosophy* গ্রন্থখানি বিখ্যাত।
রামেন্দ্রসুন্দরের পান্ডিত্য ছিল বহুমুখী। উচ্চতর গবেষণার দ্বারা বিজ্ঞানের কোনো মূল্যবান আবিষ্কার বা কোনো সুচিন্তিত তথ্যাবলি স্থাপন না করেও বিজ্ঞানের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে বিরাজমান আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তার গবেষণার কল্যাণস্পর্শে বিশ্বের বিজ্ঞানভান্ডার পূর্ণতা লাভ না করলেও, বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রগতিতে তার অবদান চিরস্মরণী
'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭)-এর আগে পর্যন্ত বাংলায় ধারে, ভারে আর প্রসাদগুণে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বিজ্ঞানরচনাগুলিই ছিল শ্রেষ্ঠ। তার নিদর্শন 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪) এবং ১৯১৪ থেকে ১৯১৭-র মধ্যে লিখিত প্রবন্ধের সংকলন 'বিচিত্র জগত্' (তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত, ১৯২০)। তাঁর সমস্ত মন্তব্যের মধ্যেই আত্মবিশ্বাসের একটা স্বাভাবিক ছাপ ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর গদ্যের আন্তরিক প্রসাদগুণ। যুক্তি ও তথ্যের সমস্ত চাহিদা কড়ায়-গন্ডায় মিটিয়ে দিয়েও তা সতত সুখপাঠ্য। 'বিচিত্র জগত্'-এর প্রতিটি পঙ্‌ক্তি রামেন্দ্রসুন্দরের স্বভাবসিদ্ধ রসস্নিগ্ধতায় স্মিত-উজ্জ্বল। একটি উদাহরণ- 'Huxley পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন - বৈজ্ঞানিক কেবল evidence চায়। এই evidence কথাটার তাত্পর্য্য মনে রাখিলে, miracle সম্বন্ধে অধিকাংশ গণ্ডগোল অনাবশ্যক হইয়া যায়। কোন ঘটনা যতই আজগুবি হোক না, বৈজ্ঞানিকের তাহাতে কিছুই যায়-আসে না। নিত্য-নূতন আজগুবি ঘটনার আবিষ্কারই বড় বড় বৈজ্ঞানিকের ব্যবসায়। আজকাল [১৯১৪] Radioactivity সম্বন্ধে যে সকল আজগুবি ঘটনা বাহির হইয়াছে, কয়েক বত্সর পূর্ব্বে তাহার সম্ভাবনাই কাহারও মাথায় আসে নাই।...'
ঠিক একশো বছর আগের এই লেখায় ত্রিবেদী মহাশয়ের বিজ্ঞান-গদ্যের অনেকগুলি লক্ষণ সহজেই চিনে নেওয়া যায়। প্রথমত, ক্রিয়াপদগুলো বাদ দিলে এ গদ্য রীতিমতো অ-'সাধু'; গুরুচণ্ডালির সচেতন ব্যবহারে

(গণ্ডগোল, আজগুবি, ঝগড়া) অতি উপাদেয় ও উপভোগ্য। দ্বিতীয়ত, অতিকথন একেবারেই নেই। উপমার আশ্রয় নিয়ে বক্তব্যকে মনোগ্রাহী করার প্রয়াসের বদলে সরাসরি বিষয়টাকেই চিত্তাকর্ষক ঢঙে হাজির করা হয়েছে। তৃতীয়ত, ইংরেজি পরিভাষার নিঃসংকোচ প্রয়োগ। তেজস্ক্রিয়া, ভৌত বিজ্ঞান, সাক্ষ্যপ্রমাণ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার না করে যথাক্রমে 'Radioactivity', 'miracle' ও 'evidence' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করায় পাঠযোগ্যতা বেড়েছে বই কমেনি। বাংলা পরিভাষা যে বিজ্ঞানরচনাকে কত শ্বাপদসংকুল করে তোলে, যাঁরাই বাংলায় বিজ্ঞান লেখেন তাঁরা সেটা হাড়ে হাড়ে জানেন। এক-শব্দে 'miracle'-এর যথার্থ সহজবোধ্য বাংলাটি পাওয়া সেদিনের মতো আজও বেশ কঠিন। বাংলা গদ্যের কাঠামো আগাগোড়া বজায় রেখে সরাসরি বিদেশি শব্দ ব্যবহার করলে বিজ্ঞানরচনার পাঠযোগ্যতা কমে না, বরং বাড়ে- এটাই যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন রামেন্দ্রসুন্দর, যিনি স্বয়ং বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে একজন দিশারি। হয়তো তিনি দেখাতে চাইছেন, এককভাবে শব্দগুলি নয়, সামগ্রিকভাবে বাংলা গদ্যের নিজস্ব ছন্দ-কাঠামোটাই পাঠযোগ্যতার, এমনকী সুখপাঠ্যতার, প্রধান পরিমানক। চতুর্থত, বিষয়ের মৌলিকত্ব। ত্রিবেদী মহাশয় বিজ্ঞানের দর্শনের গভীরে গিয়ে, বিজ্ঞানের পদ্ধতিতন্ত্র নিয়ে, বিজ্ঞানের প্রমাণপদ্ধতি নিয়ে খোলা বাংলায় 'মৌলিক' আলোচনা করেছেন। নিজের আলোচ্য বিষয়ের মৌলিকত্ব নিয়ে তাঁর মনে সংশয় ছিল না। আর বিষয়ের ভার যে তাঁর গদ্যকে নুইয়ে ফেলেনি, তার সাক্ষী তো আমরা, যারা একশো বছর আগের এ গদ্য পড়ে আজও অভিভূত হই, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি।

রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানদর্শন

বিজ্ঞানদর্শনের কোনও-কোনও প্রসঙ্গ নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বিনা দ্বিধায়, কিন্তু সতর্কভাবে দাবি করেছেন, 'আমি যেভাবে আলোচনা করিব, সেভাবে আর কেহ আলোচনা করিয়াছেন কি না, তাহা জানি না। দার্শনিক-সাহিত্যে আমার বিদ্যার দৌড় যতটুকু, তাহাতে আমি বলিতে পারিব না যে, অন্য কেহ এরূপ আলোচনা করেন নাই। যদি কেহ আমার সমর্থন করিয়া থাকেন বা করেন, তাহাতে আমার আনন্দই হইবে।' বাংলায় বিজ্ঞান-দর্শনচর্চা তাঁর হাতেই সাবালকত্ব লাভ করে, অক্ষয়কুমার দত্তের অসামান্য প্রারম্ভিক অবদানের কথা মনে রেখেও একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

অথচ রামেন্দ্রসুন্দরের পরের প্রজন্মের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানদর্শনের, বস্তুত তাঁর জীবনদর্শনের, প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। কী ছিল এই মনোমুগ্ধকর চিন্তা-সংঘাতের অন্তর্বস্তু?

রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-দর্শনের মূল বক্তব্যটি এইরকম- প্রতিটি মানুষের অন্তর্জগত্ স্বতন্ত্র। একজনের অন্তর্জগতে যা সত্য, অন্যজনের অন্তর্জগতে তা সত্য না হতেও পারে। এই অন্তর্জগত্কে প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব 'মন' নামক 'অন্তরিন্দ্রিয়' দিয়ে জানে। এই মন নামক অন্তরিন্দ্রিয়ের কল্পনাটি 'দেশী পণ্ডিত'দের বলে তিনি সশ্রদ্ধভাবে জানান। এই অন্তর্জগত্ একান্তই বক্তাসাপেক্ষ (সাবজেক্টিভ), আদৌ বক্তানিরপেক্ষ (অবজেক্টিভ) নয়। অথচ এই অন্তরিন্দ্রিয় আবার 'External বা Objective জগত্' সম্বন্ধে ধারণাও গঠন করতে পারে। 'এ-কালে যাহাকে Physical Science বলে, এই বাহ্য জগত্ তাহারই আলোচ্য বিষয়।... বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া না লইলে Physical Science-এর কোন অস্তিত্বই থাকে না।'

এখান থেকেই বিতর্কিত প্রসঙ্গগুলির সূত্রপাত। যে-বাহ্য জগতের নিয়মকানুন নিয়ে বিজ্ঞানীদের কারবার, সেই জগতের অস্তিত্বটা, বাস্তবতা নামে কথিত ব্যাপারটা, 'ধরে-নেওয়া' একটা জিনিস, আসলে তার অস্তিত্ব আছে কি না কেউ জানে না। অন্তরিন্দ্রিয় কেমন করে 'বাহ্য জগতের' খবর 'গ্রহণ করে'? এককথায়, 'চোখ-কান প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ে'র সাহায্যে। কিন্তু 'ব্যক্তিবিশেষের প্রত্যক্ষের সহিত বৈজ্ঞানিকের কোন সম্পর্ক নাই - অন্ততঃ আর সকলে যতক্ষণ সেটাকে প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার না করে।' অনেক মানুষের বহিরিন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য যদি এক কথা বলে, অর্থাত্ কোনও একটা পরীক্ষার ফল যদি বারবার একই দেয়, তাহলে সেটা 'বিজ্ঞানের সত্য'। কিন্তু বিজ্ঞানের সেই 'সত্য' কি বাস্তবতা বিষয়ে 'প্রকৃত সত্য'র হদিশ দেয়? তা বলা যাবে না।

তাহলে বৈজ্ঞানিক যে-'সত্যে'র সন্ধান দেন, তার চরিত্রটা কী? 'যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি কোন একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া সকলেরই সাক্ষ্য মিলাইয়া মিশাইয়া একটা aver-age কষিয়া লইয়া মাঝারি রকমের বর্ণনা দেন। এইরূপে বর্ণিত যে জগত্ তাহাই Physical Science-এর বর্ণিত বাহ্য জগত্ বা objective material world ... বৈজ্ঞানিকের এই জগত্ তাঁহার নিজের হাতে গড়া বা মনগড়া কাল্পনিক জগত্। এ জগত্ কাহারও প্রত্যক্ষ নহে; অতএব ইহা মন-গড়া এবং কাল্পনিক।' এই মাঝারি বা অ্যাভারেজ শব্দটা রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানদর্শনের একটা মূলশব্দ। যেহেতু 'মাঝারি' ব্যাপারটার কোনও অস্তিত্ব নেই, যেহেতু তাকে অসংখ্য অ-মাঝারি জিনিসের মধ্য

থেকে নিছক যুক্তির প্রয়োজন মেটানোর জন্য ‘তৈরি করে’ নেওয়া হয়েছে, তাই তা কখনও বাস্তবতার ‘প্রকৃত’ পরিচয় তুলে ধরতে পারে না। কথাটা যে বেশ গোলমেলে হয়ে দাঁড়াল, তা ত্রিবেদীমশাই বুঝেছিলেন- ‘দাঁড়াইতেছে এই - যেটা প্রত্যক্ষ, বিজ্ঞানের নিকট সেটা ঠিক নহে; আর যেটা প্রত্যক্ষ নহে - একেবারে কাল্পনিক, সেইটাই বিজ্ঞানের নিকট ঠিক। বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষবাদের ইহাই তাত্পর্য। ব্যাপারটা দাঁড়াইল একটা paradox; ... বিজ্ঞান যেগুলাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বা Laws of Nature বলে, সেগুলা বৈজ্ঞানিকের এই কাল্পনিক জগতের মধ্যেই ঘটে; কেননা, বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের জগতের মধ্যেই এগুলার আবিষ্কার করিয়াছেন।’
এ বক্তব্যের মধ্যে বৈদান্তিক মায়াবাদের ছাপ সুস্পষ্ট।

একদেশদর্শী তর্করাশি

সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই জায়গাটাই মানতে পারেননি। তিনি নিজে ছিলেন ‘রিয়্যালিস্ট’, মন-নিরপেক্ষ বাস্তব জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব নিয়ে তাঁর মনে কোনও সংশয় ছিল না। চাঁদটা সত্যি সত্যিই ‘ওই ওখানে’ আছে, এ বিশ্বাস যদি আমার না-ই থাকবে, তাহলে চাঁদ নিয়ে আমি মাথা ঘামাব কেন? এ বিষয়ে তাঁর ‘মাষ্টারমহাশয়’ অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর কোনও দ্বিমত ছিল না। তিনি জানতেন, কত কঠিন বিধিনিষেধের বেড়া পার হয়ে তবে বিজ্ঞান কোনও একটা ধারণাকে সাময়িকভাবে মান্যতা দেয়। সেই ধারণা পুরোপুরি না হোক, আংশিকভাবে বাস্তব জগত্কে অনুধাবন করার কাজে লাগে, এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না। অথচ রামেন্দ্রসুন্দর দর্শনগতভাবে বিজ্ঞানের সেই বাস্তব-জাগতিকতাকে অস্বীকার করছেন, বলছেন বিজ্ঞানের চর্চার জগত্ আসলে একটা ধরে-নেওয়া, কাল্পনিক জগত্! সত্যেন্দ্রনাথের মতে, এর মূলে ছিল ত্রিবেদী মশায়ের পশ্চাদ্মুখী বেদপন্থী সমাজের স্বপ্ন। একদিকে বৈদান্তিক মায়াবাদ, অন্যদিকে ‘বেদপন্থী’ সমাজের স্বপ্ন, এই দুয়ের পরিষ্কার সাযুজ্য দেখতে পেয়েছিলেন তিনি।
সত্যেন্দ্রনাথ বলছেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থার ‘সাফাই গাইবার প্রবৃত্তিটি বোধহয় বেদপন্থী ত্রিবেদীসন্তানের মধ্যে প্রবেশ করলো।’ ‘মাঝারি’ মাপের কেরানি-উত্পাদক ঔপনিবেশিক শিক্ষাকলের প্রতিকার হিসেবে ত্রিবেদীসন্তান পুরাকালের বিশুদ্ধ বৈদিক শিক্ষা ও সমাজপ্রণালী ফিরিয়ে আনার কথা বললেন: ‘বেদপন্থী সমাজে জন্মিয়া পুরাতনী বিদ্যার অজ্ঞতা নিতান্ত ভাগ্যহীনতার লক্ষণ বলিয়া আমি বোধ করিতাম।’ তাঁর মতে, এমনকী ঊনবিংশ শতকের বঙ্গদেশেও ‘চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ অধ্যাপক হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানে দণ্ডায়মান আছেন। এখনও সেই প্রাচীন কালের পদ্ধতির বিশুদ্ধ ধারা ক্ষীণস্রোতে এই দেশে বহিয়া আসিতেছে। এখনও নাকি সিন্ধুতীর ও কৃষ্ণাতীর হইতে নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে ভক্তিমাত্র দক্ষিণা ও উপহার লইয়া ছাত্রেরা শিক্ষক সমীপে উপস্থিত হয়।’ প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও বিদ্যাধারা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের এই স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি সম্পর্কে বিদ্যাসাগর-পন্থী সেকুলার যুক্তিবাদী সত্যেন্দ্রনাথের কড়া টিপ্পনী: ‘এই যুক্তির ওপর ভিত্তি করলে বর্তমানে [১৯৬৪] পাকিস্তানের ইসলামী রাজ্যস্থাপন বা জনসঙ্ঘের [তখনও ভারতীয় জনতা পার্টি অজাত] হিন্দুরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনাকে সমালোচনা করলে চলবে না।’ শুধু তাই নয়, ‘রামেন্দ্রসুন্দরের সমাজরক্ষণশীলতা শেষ অবধি পুরাতনী মনোভাবে পরিণত হয়েছে। গান্ধীবাদী ও হিন্দু সঙ্ঘওয়ালাদের, স্বতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে সাদৃশ্য প্রবল। রিপন কলেজে শিক্ষকমহলে তখনকার দিনে এই মনোভাবের বিকাশই প্রশংসিত হত।’ সত্যেন্দ্রনাথের সখেদ মন্তব্য: ‘মাঝে মাঝে মনে হয়, ত্রিবেদী মশায়ের মতো তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিক্ষক যদি রিপন কলেজের মত স্থানে কাল না কাটিয়ে এমন কোনো স্থানে অধ্যাপনা করতেন - দেশের নবীন মনের সঙ্গে যেখানে সাক্ষাত্ হওয়া সম্ভব ছিল, তাহলে এই সাময়িক একদেশদর্শী তর্করাশির পরিবর্তে হয়তো চিরস্থায়ী মৌলিক চিন্তাভাবনা আমরা তাঁর কাছ থেকে পেতে পারতাম।’ সত্যেন্দ্রনাথের আক্ষেপ, যে-মানুষটি বাংলায় বিজ্ঞান-প্রচারের জন্য চিরনমস্য হয়ে রয়েছেন, তিনিই অবশেষে ‘বর্তমান বিজ্ঞানের আবশ্যকতা... স্বীকার করতেন না।’ ‘চিরস্থায়ী মৌলিক চিন্তাভাবনা’ বলতে সত্যেন্দ্রনাথ কী বোঝাচ্ছেন, তার কিছুটা আভাস পাই এই মন্তব্যে: “এমন কিছু মৌলিক দর্শনতত্ত্ব লেখা, যার মধ্যে প্রতীচ্যের বিজ্ঞান, দর্শন, বিবর্তবাদের সঙ্গে এদেশের অন্বয়বাদ এবং বৌদ্ধ হেতুবাদের সমন্বয় থাকবে। হয়তো ‘বিচিত্র প্রসঙ্গে’র মধ্যে সেরূপ চেষ্টা দেখা যায়।”
ভারতে বিজ্ঞানচর্চায় যাঁরা যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন, দেশের সেই নবীন বিজ্ঞানজিজ্ঞাসুদের কাছ থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের এই দূরত্বের প্রসঙ্গটি সত্যিই ভাবায়। এঁদের মনে হয়েছিল ত্রিবেদীমশায় একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির গণ্ডিতে আটকে পড়েছেন এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ভাবনায় আক্রান্ত।

রামেন্দ্রসুন্দরের দোলাচল

সত্যেন্দ্রনাথের এই মূল্যায়ন মোটের ওপর ঠিক হলেও, রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাধারার অন্য এমন কতগুলো মাত্রা ছিল, যা তাঁকে সরাসরি বিজ্ঞানবিরোধী হিন্দুত্ববাদী শিবিরে ঠেলে দেয়নি। ১৮৯৯-এর 'ফলিত জ্যোতিষ' প্রবন্ধে যখন তিনি জ্যোতিষীদের সম্মুখসমরে আহ্বান করে লেখেন, 'চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার-ভাঁটা হয়, অতএব রামবাবুর জজিয়তি হইবে না কেন, এরূপ যুক্তি চলিবে না', তখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কট্টর এম্পিরিসিস্ট, যুক্তিধারা নিখাদ আরোহী। সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই 'বিচিত্র জগত্'-এ রামেন্দ্রসুন্দরের অন্য এক অন্বেষণের ধারার কথা বলেছেন। 'বিচিত্র জগত্'-এ 'প্রজ্ঞার জয়' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর লেখেন, 'ইতর জীবের হস্তে এই প্রজ্ঞাস্ত্র নাই। মানুষ ইহার উদ্ভাবনা করিয়াছে। ... আপনার অভিজ্ঞতার সহিত বর্তমানকে ও ভবিষ্যত্‌কে যোগসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত্ উভয় ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়া অসীম সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। এই প্রজ্ঞার অস্ত্র বিজ্ঞানময় অস্ত্র।' এই 'বিজ্ঞানময় অস্ত্র'র জয়গান গেয়েই 'বেদপন্থী' বিজ্ঞান-দার্শনিক মুক্তকণ্ঠে বলেছেন: 'বৈজ্ঞানিক এই বিজ্ঞানাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বাঙ্ময় জগত্ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং বাঙ্ময় জগতের অনুশাসনে প্রত্যক্ষ জগত্‌কেও আপনার বশীভূত করিয়াছেন। বিজ্ঞান-বিদ্যার এইজন্য এত স্পর্ধা। মানুষের কারবার প্রত্যক্ষ জগতে। প্রজ্ঞাবলে সেই প্রত্যক্ষ জগত্ মানুষের বশীভূত। প্রজ্ঞাবান মানুষ প্রত্যক্ষ জগতের প্রভু; অতএব প্রজ্ঞারই জয়।' এটা আর যা-ই হোক, মায়াবাদী বিজ্ঞান-দার্শনিকের কণ্ঠ নয়।

একটা চিন্তা-বিবর্তনের লক্ষণ অবশ্যই এখানে পরিস্ফুট। সে-বিবর্তন পূর্ণতা পাওয়ার আগেই মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে ঘোর ব্যক্তিগত দুঃখতাপে ক্লিষ্ট রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত আগে বাক্‌রুদ্ধ, অশক্ত রামেন্দ্রসুন্দর সদ্য 'ছার' উপাধি-ত্যাগী রবীন্দ্রনাথকে শয্যাপার্শ্বে টুলের উপর দাঁড় করিয়ে পদধূলি নিচ্ছেন আর তাঁর দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে শ্রদ্ধাশ্রু-সেই মর্মস্পর্শী চিত্রটি প্রত্যেক বাঙালির অন্তরে অনপনেয় হয়ে রয়েছে।

আসলে উনিশ শতকে জাত বেশির ভাগ বাঙালি মনীষীর মতো রামেন্দ্রসুন্দরও পার্থ চট্টোপাধ্যায় কথিত কয়েকটি 'টুকরো টুকরো' নেশনে বাস করতেন। বুদ্ধিজগতে তিনি আধুনিক বিশ্বনাগরিক, আধুনিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব তাঁর কাছে সমধিক; কিন্তু মনের সাংস্কৃতিক গহনে, স্বাদেশিকতার নির্মাণে, তিনি প্রাচীন হিন্দু ভারতের মডেলে বিশ্বাসী। সত্যেন্দ্রনাথের সমালোচনা আমাদের এই দ্বৈত সত্যের প্রতি উন্মুখ করে।

আচার্য **রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী** (আগস্ট ২০, ১৮৬৪ - জুন ৬, ১৯১৯)[১] বাংলা ভাষার একজন বিজ্ঞান লেখক। তিনি ভারতের মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন।[২] তার পূর্বে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। উপযুক্ত বইয়ের অভাবই ছিল এর মূল কারণ। তিনি প্রচুর গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন এবং বক্তৃতার মাধ্যমে বাঙালিদেরকে বিজ্ঞান চর্চায় অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর কোনো মৌলিক গবেষণা বা আবিষ্কার নেই, তবে তিনি মূলত লেখনীর মাধ্যমেই একজন বিজ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞের মর্যাদা লাভ করেছেন। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ছাড়াও তিনি দর্শন ও সংস্কৃত শাস্ত্রের দুর্বোধ্য বিষয়গুলো সহজ বাংলায় পাঠকের উপযোগী করে তুলে ধরেন।[*তথ্যসূত্র প্রয়োজন*]

পরিবার ও প্রাতিস্বিক জীবন

রামেন্দ্রসুন্দর ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার জেমো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম গোবিন্দসুন্দর এবং মা চন্দ্রকামিনী। বাংলা ভাষার চর্চার জন্য বিখ্যাত হয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর, কিন্তু জন্মসূত্রে তিনি বাঙালি ছিলেন না। তার পূর্বপুরুষরা বন্ধুগল গোত্রের জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মের দু-শ বছর আগে থেকেই মুর্শিদাবাদে বসবাস করতো। এর ফলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের সকলের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং এক অর্থে তারা বাঙালিদের মতই বাংলার চর্চা করতে শিখেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সূচনার আগেই ১৮৭৮ সালে মাত্র ১৪

বছর বয়সে জেমো রাজপরিবারের নরেন্দ্র নারায়ণের কনিষ্ঠ কন্যা ইন্দুপ্রভা দেবীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

শিক্ষাজীবন

১৮৮২ সালে কান্দি ইংলিশ স্কুল থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হন। বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজের একজন প্রাক্তনী এই রামেন্দ্র।[৩] ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফএ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। একই কলেজ থেকে ১৮৮৬ সালে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান উভয় সাম্মানিক স্নাতক পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৭ সালে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তরেও প্রথম স্থান অর্জন করে নেন ত্রিবেদী; ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান।[১][২]

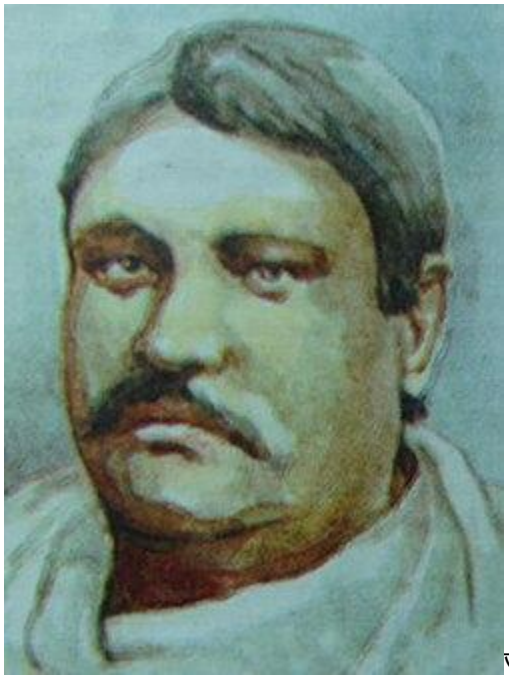
আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রতিকৃতি

শিক্ষকজীবন

১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে রিপন কলেজে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। পরে প্রথমে ছয় মাসের জন্য অস্থায়ী অধ্যক্ষ এবং শেষে স্থায়ী অধ্যক্ষ হন। ১৮৯২ সালে রিপন কলেজেই পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের অস্থায়ী অধ্যাপক হিসেবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কর্মজীবন শুরু হয়। পরবর্তী ছয় মাসে তিনি স্থায়ী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ১৯০৩ সালে তিনি এই কলেজের স্থায়ী অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন, আমরণ সে পদেই বহাল ছিলেন।[১]

বিজ্ঞানসাহিত্য

তিনি বাংলা সংস্কৃতির ধারা বজায় রাখার জন্যই ১৮৯৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গঠন করেন যা তখনকার সর্বোচ্চ গুণমানী প্রতিষ্ঠান ছিল। তিনি ১৯০৪ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন।[৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্পর্কে বলেন:

বাংলার লেখকমণ্ডলীর মধ্যে সাধারণত লিপিনৈপুণ্যের অভাব দেখা যায় না; কিন্তু স্বাধীন মননশক্তির সাহস ও ঐশ্বর্য অত্যন্ত বিরল। মনন ও রচনারীতি সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের দুর্লভ স্বাতন্ত্র্য ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার সেই খ্যাতি বিলুপ্ত হইবে না। বিদ্যা তাঁহার ছিল প্রভূত, কিন্তু সেই বিদ্যা তাঁহার মনকে চাপা দিতে পারে নাই। তিনি যাহা বলিতেন, তাহার বিষয়বিচারে অথবা তাহার লেখন-প্রণালীতে অন্য কাহারো অনুবৃত্তি ছিল না।[৫]

প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

- *জিজ্ঞাসা* (১৯০৩)[১][৬]
- *বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা* (১৯০৬)
- *চরিত কথা* (১৯১৩)[৭]
- *শব্দকথা* (১৯১৭)[১]
- *বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ*
- *ধর্ম্মের জয়*
- *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* (অনুবাদ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ)
- *জগৎ কথা*
- *কর্ম্ম-কথা* (১৯১৩)[১]
- *বিচিত্র জগৎ* (১৯১৩)[১]
- *প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম্ম*
- *মায়া-পুরী*
- *প্রকৃতি* (১৩০৩ বঙ্গাব্দ)[২]
- *বিচিত্র প্রসঙ্গ* (১৩২১ বঙ্গাব্দ)[২]

মৃত্যু

১৯১৯ সালের ৬ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[২]